তাহারা চাহে যুক্তি। পূর্ব্বকালের ন্যায় দৃঢ়বিশ্বাসের বশ-বর্ত্তী হইয়া যুক্তির দ্বারা সদসত্ বিবেচনা না করিয়া, "গুরুদেব বলিয়াছেন বা ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে" বলিয়াই যে এখানকার মানুষ কোন ঐহিক বা পারলৌকিক কার্য্য করিবে তাহার আশা আর বড় করা যাইতে পারে না।

তাহাই যদি হইল, তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের সমাজকে ধর্ম্মের সহিত মিলাইয়া উন্নত করিতে হইলে নির্দ্দোষ ও সুগম যুক্তিদ্বারা কোন্‌টী ধর্ম্মের আভ্যন্তররূপ কোন্‌টীই বা বাহ্যরূপ? কিসে তাহার উন্নতি বা অবনতি হয়? তাহা অগ্রে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

তাহা বুঝিবার উপায় কি? সত্য বটে, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের স্বরূপ বুঝিবার একমাত্র সর্ব্বপ্রধান উপায় বেদ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, আমরা সকলে, বেদ বুঝিয়া আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিব তাহা সম্ভবপর নহে, কারণ আমাদেব সমাজে ব্রহ্মচর্য্য উঠিয়া গিয়াছে ও গুরুকুল-বাস কাহাকে বলে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতি অবশ্য-পাঠ্য বেদাঙ্গ গুলি বুঝাইবার উপযোগী সম্প্রদায় ও আমাদের দেশে লুপ্ত-প্রায় হইতে চলিল, এই সকল অপরিহার্য্য অসুবিধা বশতঃ আমরা সেই দুরধিগম অতি বিস্তৃত বেদ বুঝিবার শক্তি একেবারে হারাইয়া বসিয়াছি; ঐরূপ অবস্থায় আমরা যে বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া [illegible]দের ধর্ম্মের ও সমাজের অধিকারানুরূপ উন্নতিবিধান করিব, তাহা সম্ভবপর নহে। বেদ ছাড়া ধর্ম্ম বুঝিবার আমাদের আরও কতকগুলি উপায় আছে, যেমন ধর্ম্মসংহিতা, কল্পসূত্র, পুরাণ, ও তন্ত্র ইত্যাদি। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে এই সকল উপায়ও আমাদের পক্ষে আপাততঃ বিশেষ উপকারজনক হইবে এরূপ বোধ হয় না। কেন, তাহা বলি, প্রথম ধরুণ কল্পসূত্র, কল্পসূত্রে যে ভাবে ধর্ম্মোপদেশ করা হইয়াছে. তদনুসারে

এক্ষণে আমাদের সমাজের চলা সুকর নহে, কারণ কল্প-সূত্রগুলি দুইভাগে বিভক্ত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত, তন্মধ্যে শ্রৌতসূত্র-গুলিতে যে জাতীয় ধর্ম্মের কথা উল্লিখিত, হইয়াছে তাহা এক্ষণে আমাদের সমাজে অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে, এ যুগে আবার সেই লুপ্ত অংশগুলির উদ্ধারের সম্ভাবনা কিছুতেই করা যাইতে পারে না। স্মার্ত্তগৃহ্য সূত্রোক্ত কতকগুলি কার্য্য আমরা এক্ষণও করি বটে, কিন্তু উহাতে প্রচলিত উপাসনা-কাণ্ডপ্রভৃতি বহুতর বাঞ্ছনীয় অংশগুলি না থাকায় এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পথও ক্রমে অপ্রশস্ত হওয়ায়, উহাদ্বারা আমাদের মনকে স্থির করিয়া যে আমরা ধর্ম্মপথে একাগ্র-চিত্তে অগ্রসর হইতে পারিব, তাহাও সম্ভব নহে।

তাহার পর পুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, বা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল এত বেশী ও আপাততঃ এতই বিরুদ্ধার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় যে তাহাদ্বারা আমরা আমাদের অভিলাষ ও অধিকারানুরূপ পরমার্থধর্ম্মেরস্বরূপ অনায়াসে বুঝিয়া যে তদনুসারে অনুষ্ঠান করিব তাহাও বলা কঠিন।

কিন্তু গীতার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া, আমরা এই সকল অসুবিধার একটীও দেখিতে পাই না। গীতা বিস্তৃত গ্রন্থ নহে, সাত শত শ্লোক হইল গীতার পরিমাণ বোধ করি আমা-দের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই একমাসের মধ্যেই গীতার সকল অংশ মুখস্থ করিতে পারেন. তাহার পর গীতার ভাষা অত্যন্ত স[illegible] নিজ বুদ্ধি ও প্রয়োজনানুসারে সকল ব্যক্তিই গীতা হইতে কিছু না কিছু সার বাছিয়া লইয়া নিজের জীবনের মহৎলক্ষের দিকে বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে পারেন এ কথা যে নিতান্ত অলীক নহে, তাহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়।

তাহার পর গীতার সহিত কোনধর্ম্মের কোনপ্রকার বিরোধ নাই। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব কেহই গীতার অভ্যন্তরে এমন কিছুই খুজিয়া পান না, যাহা দেখিয়া তিনি গীতাকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া উপেক্ষা

করিতে পারেন। "দেশ-ভেদে, কাল-ভেদে, সমাজ-ভেদে ধর্ম্মের বাহ্য আকার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল ধর্ম্মের মূলে, এক অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্যপ্রকাশ, ও সর্ব্বানুস্যূত বস্তু, যাবতীয় ধর্ম্মনীতির কেন্দ্র শক্তির আধাররূপে বিদ্যমান আছে। ব্যবহার জগতে তুমি আমিও সে পরস্পর পৃথক্ হইলেও তোমার আমার বা তাহার মধ্যে পারমার্থিক ভাবে কোন প্রকার অণুমাত্রও পার্থক্য নাই।" মনুষ্য জীবনের চরিতার্থতার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য এই মহান্ সত্যধর্ম্মকে গীতা যেমন সরলভাবে নির্দ্দোষ ও সুগম যুক্তির সহিত ব্যবস্থাপন করিয়াছে আমাদের অবলম্বনীয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ সেরূপ সরলভাবে ও নির্দ্দোষ যুক্তিদ্বারা এই মহান্ সত্য ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এইসকল কারণে আমাদের এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের দিনে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে গীতোক্ত পঞ্চম ধর্ম্মের অবলম্বনই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। ভাগ্যক্রমে দেশের অনেক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিই এই বিষয়টী বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, বেশী দূরে যাইতে হইবে না এই গীতা সমিতিই তাহার আশাপ্রদ নিদর্শন। এই সমিতি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ইহার পবিত্র লক্ষ্যের দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সমাজের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হউক, ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। এই সমিতিতে গীতোক্ত কর্ম্ম-যোগ বিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিব তাহাতে আমার অজ্ঞতার দোষে অনেক কথায় সকলের [illegible] মত্য না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি গীতা সমিতির মহান্ লক্ষ্যের সহিত তাহাতে বড় বৈষম্য থাকিবে না, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি যাহা কিছু বলিব তাহাতে আপনাদের অবধান প্রার্থনীয়।

শ্রীহরির্জয়তি।

গীতাকর্ম্মযোগ।

আমাদের সংস্কৃত দার্শনিকগণ অনেকেই অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" অর্থাৎ এসংসারে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যও কোন না কোন একটী প্রয়োজনকে লক্ষ্য না করিয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আমিত্ব, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ঐ প্রয়োজন জ্ঞান। ঐ প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য সামর্থ্যানুসারে প্রবৃত্তিই যে আমার আজন্মসিদ্ধ অবস্থা, এ কথা আমিত্ব জ্ঞান থাকিতে কে অস্বীকার করিতে পারে?

ঐশ্বর্য্যের লীলাময় সমুন্নত প্রাসাদ হইতে, অনন্ত ও অপ্রতি-বিধেয় অভাবের জীবিত চিত্র-স্বরূপ দরিদ্রের জীর্ণ পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, মানবের বাসোপযোগী এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে, এই প্রয়োজনজ্ঞানের তীব্র কশাঘাতে সংসারী মানব, দিগ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ অধীর ভাবে বিচরণ না করিতেছে? এক কথায় বলিতে গেলে এই প্রয়োজন জ্ঞানই লৌকিক ব্যবহার জগতের মূলভিত্তি, এ ভিত্তি না থাকিলে, লৌকিক ব্যবহার জগতে আর আকাশকুসুমে, কোন প্রভেদই থাকে না।

শুধু লৌকিক ব্যবহারজগতই বা বলি কেন, ধর্ম্মজগতের প্রতি দৃ[illegible] কি দেখিবে? আমি কর্ত্তা, সুতরাং কর্ম্মানুসারে ফলভোগ আমিই করিব। এজগতে এ জন্মে সময়ে না কুলাইলেও, দূর—অতি দূরের ভবিষ্যৎ জীবনে, আমিই ইহার ফল ভোগ করিতে বাধ্য, সুতরাং এ জগতের প্রয়োজনবৎ পরলোকের প্রয়োজন বুঝিয়া তদনুসারে আমাকে চলিতেই হইবে, এইপ্রকারবিশ্বাস যাহার মূলভিত্তি, সেই ধর্ম্ম জগতেও যাঁহারা বিচরণ করেন তাঁহারাও এই প্রয়োজন-জ্ঞানের অধিকার হইতে বহির্ভূত নহেন। বুদ্ধদেব, মুষা, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা গৌরাঙ্গদেব, যে সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রচার করিয়া

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানবের হৃদয়ে, শান্তিময় নন্দন-কাননের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, কে বলিতে পারে যে ঐ সকল ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষের মূলে, এই প্রয়োজন জ্ঞানরূপ জলসেচনে জীবনীশক্তির সঞ্চার না হইয়াছে? দেহ ও ইন্দ্রিয়সমষ্টিতে অনতিক্রমণীয় আত্মাভিমানের বাহিরে গিয়া কোন্ ধর্ম্মসমাজ এ পর্য্যন্ত আত্মমাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে?

তাই বলিতেছিলাম যে প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে পারে না এই দার্শনিক বাক্যটী যে ব্যবহার জগতে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

আমরা কিন্তু আজ যে গীতার তত্ত্ব অনুশীলন করিবারজন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, সেই গীতার সিদ্ধান্ত এই সার্ব্বজনীন সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত! গৌতম, পতঞ্জলি, কণাদ ও কপিল প্রভৃতি বড় বড় দার্শনিকগণ যে প্রয়োজন জ্ঞানকে মনুষ্য সমাজে ঐহিক ও পারত্রিক শুভাশুভ প্রাপ্তির অসাধারণ হেতু বলিয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বাণিজ্যনীতি ও সমাজনীতির একমাত্র মূল ভিত্তি বলিয়া, যে প্রয়োজনজ্ঞানকে, সকলদেশের সকল সভ্য সমাজের মনীষিবৃন্দ একবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন সেই প্রয়োজন জ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যই ভগবান বাসুদেব কু[illegible]ারম্ভের প্রথমে অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে এই গীতা শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আমরা যে অংশই পর্য্যবেক্ষণ করি, কি দেখি? দেখি গীতার প্রতি শ্লোকে, প্রতি ছত্রে, প্রতি অক্ষরে এই একই ভাব যেন একটানা স্রোতে বহিয়া যাইতেছে! গীতা একই স্বরে একই ভাবে যেন কেবল গাহিতেছে,—"মানুষ কলের পুতুল ছাড়া আর কিছু নহে! জীবের কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অনাদিসঞ্চিত বাসনাময় কল্পনাকুসুমের সুপরিণত ফলমাত্র।

মানুষের হাত আছে, কিন্তু ধরিবার শক্তি নাই, মানুষের চরণ আছে কিন্তু সে নিজে চলিতে পারে না, মানুষের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, জিহ্বা আছে, নাসা আছে ও ত্বগিন্দ্রিয় আছে, কিন্তু মানুষ নিজে স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, আস্বাদন করে না, ঘ্রাণ করে না এবং স্পর্শও করে না। ছায়াবাজির ছবি হাসে, কাঁদে, গায়, বেড়ায় বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যেমন সে হাসে না, কাঁদে না, খায় না, মানুষও সেই প্রকার এই সুবিস্তীর্ণ সংসার-পটে ছায়াবাজির পুতুলের ন্যায় সব কায করে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ নিজে কিছুই করে না।

গামাবিশ্যচভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বারসাত্মকঃ॥
অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্॥
ঈশ্বরঃ সব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানিমায়য়া॥
প্রকৃত্যৈবচ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানং অকর্ত্তারং সপশ্যতি॥

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্ব[illegible]ঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহ মিতিমন্যতে॥

এই সকল [illegible] এইপ্রকার আরও অনেক গীতারবাক্য সমূহের প্রতি লক্ষ করিলে আমরা কি বুঝি? আমরাবুঝি যে জীবের কর্ত্তৃত্ব আভিমানিক, বাস্তবিক তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, যে অচিন্ত্য শক্তি অনন্ত প্রকৃতি, অনাদি অনন্ত অসীম অন্ধকারময় সেই অব্যক্তরূপ মহাপ্রলয়সাগর হইতে, এই বিচিত্র অচিন্ত্য অনন্ত অপার পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের বিকাশ করিতেছে এবং কোনএক অনির্ব্বচনীয়বিশ্বগ্রাসিনীশক্তির বলে ইহাকে আবার সেই অব্যক্তরূপমহাপ্রলয় সাগরের কোন এক

প্রান্তে মিশাইয়া দিতেছে। সেই প্রকৃতি, সেই অঘটনঘটনা পটীয়সী মায়া বা প্রকৃতি, যাহা করিতেছে তাহাই হইতেছে; সে যাহা করে না তাহা কখনই হইতেপারে না। কেহ তাহাকে অদৃষ্ট বলে, কেহ তাহাকে স্বভাব বলে, কেহ তাহাকে অবিদ্যা বলে কেহ বা তাহাকে ঐশী মহাশক্তি বলে। যে যাহা বলিতে চাহে বলুক, কিন্তু তাহারই প্রেরণায় চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণ ফিরিতেছে ফিরিবে, নক্ষত্র হাসিতেছে ও হাসিবে, মেঘ বর্ষিতেছে ও বর্ষিবে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ও চমকাইবে, তাহারই প্রভাবে মানুষ, কথা কহিতেছে, রূপ দেখিতেছে, গন্ধের আঘ্রাণ করিতেছে, শব্দ শুনিতেছে, রসের আস্বাদ করিতেছে এবং শীত বা উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিতেছে। আমরা যাহা কিছু ভাবি, আমরা যাহা কিছু করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহা ভাবিনা, আমরা তাহা করি না, সেই সর্ব্ববিশ্বোৎপাদিনী মহীয়সী প্রকৃতিই তাহা করে এবং সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ী ঐশী শক্তিই তাহা ভাবে, ইহাই হইল ভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত; এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইলে মানুষের কর্তৃত্বাভিমান মিটিয়া যায়, জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত ধারণা উল্টাইয়া যায় এ পর্য্যন্ত যাহা সত্য বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহা সকলই মিথ্যা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া পড়ে!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই কর্ম্মাভিমানধ্বংস কর, দুরধিগম সিদ্ধান্ত, মুক্তকণ্ঠে যে গীতা প্রচার করিতেছে সেই গীতাই কিন্তু আমাদের অনন্ত কর্ম্মময়, অনন্ত লক্ষ্যময়, অনন্ত অধি-কারীভেদে ভিন্নরূপ, হিন্দুধর্ম্মের একমাত্রসারভুত গ্রন্থ বলিয়া, ইহার প্রচারের প্রথম দিন হইতে এই কাল পর্য্যন্ত সকল মনীষীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। যে সিদ্ধান্ত গীতা প্রচার করিতেছে, তাহার অঙ্গীকার প্রকৃত-পক্ষে যে করে, সে কি কখন পূর্ব্বের ন্যায় আবার দৃঢ়তাসহ-কারে অনন্ত কামনাময় শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?

কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান মিটিলে কি আর মানুষ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জ্ঞানসাপেক্ষ ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকারী হইতে পারে? যাহার এতটুকু বুঝিবার শক্তি আছে, সে মুক্তকণ্ঠে বলিবে যে, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। এ সিদ্ধান্ত যদি গীতা প্রচার করিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হয় যে গীতা সনাতন ধর্ম্মের অনুকূল সিদ্ধান্ত প্রচার করে নাই, ইহা সন্ন্যাসীর গ্রন্থ, সংসারে থাকিতে হইলে গীতার উপর নির্ভর করা উচিত নহে, গীতা সংসারের মিত্র নহে, ইহা সংসারাশ্রমের শত্রু।

এই বিষম সমস্যার মীমাংসা না করিতে পারিলে গীতার অনুশীলন করা আমাদের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যাহারা গীতা শাস্ত্রের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারা এই সমস্যার মীমাংসা অতি বিশদ ভাবে করিয়া গিয়াছেন তাহাদের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি তাহাদেরই প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া এই সমস্যার মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইব। আশা করি, গীতাভক্ত সহৃদয় শ্রোতা মহাশয়গণ একটু ধীরতার সহিত বক্ষ্যমাণ বিষয়টীর অনুধাবন করিবেন বিষয়টী গুরুতর সুতরাং এসময় আমার এই বিনীত প্রার্থনা বোধ করি বিরক্তিকর হইবে না।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জগতে এমন কেহ নাই যে কার্য্য না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে, অবশ জীব প্রকৃতিজ গুণসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকল সময়েই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

আমাদের জীবনে সহস্র সহস্রবার এমন ঘটিয়াছে যে, —যেকার্য্য আমি করিতেচাহিনা, পূর্ব্বাপর দোষ বিবেচনা করিয়া যে-কার্য্যকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমি শতশতবার

মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছি, ঘটনা স্রোতে পড়িয়া, অবস্থা বিশেষে আমি বাধ্য হইয়া আবার সেই কার্য্য করিয়াছি, ব্যবহার ক্ষেত্রে, এমন মনুষ্য কে আছে, যে স্পর্দ্ধার সহিত, অকম্পিতহৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে যে আমি কখনও আমার বিবেক ও অভিলাষের বিরুদ্ধে এ জন্মে কোন কার্য্যই করি নাই? মহানদীর প্রবলবেগের সম্মুখে যেমন বালির বাঁধ দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া নদীর স্রোতে মিশিয়া যায় সেইরূপ কর্ম্মানুসারে ফলভোগরূপ মহাসমুদ্রের দিকে, প্রবলবেগে বহনশীল মানব প্রকৃতির একটানাস্রোতে চঞ্চল হৃদয়ের প্রতিকূল সঙ্কল্প, দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া ঐ প্রকৃতির অনুকূলরূপ ধারণ করিয়া থাকে। আহার করিবনা এইপ্রকার সঙ্কল্প সেই পর্য্যন্তই থাকিতে পারে যে পর্য্যন্ত না ক্ষুধার তীব্র উদ্রেক হয়, সর্ব্বাঙ্গশোষিণী তৃষ্ণারউদয় হইলে কে এমন আছে যে জলপান না করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিতে পারে? কে এমন কামুক আছে যে যুবতীর কমনীয় মুখচন্দ্র সম্মুখে উদিত হইলে, সহস্রবারের নাদেখিবার প্রতিজ্ঞাকে আগ্রহ সহকারে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত না হয়? দারিদ্র্যের কঠোর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইলেও কোন দয়ালু সাধু বুভুক্ষিতের তীব্রক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিতে উৎসুক না হয়েন? ইহাই জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জন্মজন্মান্তরের অভ্যাস জনিত সংস্কারের সাহায্যে কার্য্যোন্মুখ প্রকৃতির অধীনতাই জীবের স্বভাব। একদিন একমাস একবর্ষ বা একজন্মের অভ্যাসে এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, এই জন্যই ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে——

সতুদীর্ঘকালাদর নৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়ভূমিঃ।

ভগবানও গীতাতে বলয়িাছেন যে—

বহূনাং জন্মনা মন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥

ইহাই যদি মানবের প্রকৃতি হইল, আর সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলা, যদি মানবের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভবই হইল, তাহা হইলে, এই জ্ঞানশাস্ত্র গীতা দ্বারা আমাদের ন্যায় ঘোর সংসারপ্রকৃতিসম্পন্ন মানবের কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? ইহাই আমাদের পক্ষে এক্ষণে প্রধানতঃ আলোচনীয় হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং এক্ষণে আমি সেই আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

সহস্র সহস্র মঙ্গলকর উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া মানব নিজনিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, একথা ভগবান্‌ও গীতাতেই প্রকাশ করিয়াছেন

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মনুষ্য জ্ঞানী হইয়াও নিজ প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিয়াই থাকে। প্রাণিনিচয় নিজপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে; এরূপ অবস্থায় নিগ্রহ (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধ) কি করিতে পারে?।

এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন তাহাও দেখা যাক্।

"যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, নচ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে।"

(যদি সকল জীবই নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টাই করে এবং প্রকৃতি শূন্য কেহই হইতে পারে না, তাহা হইলে পুরুষকারের বিষয় অনুপপন্ন হইল; সুতরাং শাস্ত্রের বিধি বা নিষেধ নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ইহা বলিতেছেন)। ইহার উত্তর স্বরূপ গীতা কি বলিতেছে তাহাও বলি

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশ মাগচ্ছেত্তৌহ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥

আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়-বেদ্য বিষয়েই অনুকূল ও প্রতিকূল ধারণানুসারে রাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে ; সেই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইবে না, সেই রাগ ও দ্বেষ পুরুষের সর্ব্বানর্থ প্রাপ্তির হেতু।

এক্ষণে একটু বিচার করিয়া দেখিতে হইতেছে, যে বাস্তবিক শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধের সার্থক্য কোন্ অংশে কিরূপভাবে দাঁড়াইতেছে ? একটু প্রণিধান করিলে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, যে আমরা যে কোন কার্য্যই করি, সেই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে রাগ বা দ্বেষ আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং ঐ কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমরা একটা ভারী রকমের উল্লাস অনুভব করি, এবং সেই উল্লাসের পশ্চাতে পশ্চাতে অলক্ষিতভাবে গর্ব্ব আবির্ভূত হইয়া, আমাদের হৃদয়ের ভাবকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর করিয়া তুলে ; আবার যদি বিহিত চেষ্টা করিয়াও আমরা ঐ কার্য্যটী সিদ্ধ করিতে না পারি, তাহা হইলে, কি যেন কি একপ্রকার প্রলয় ঘনঘটার ন্যায় দুরন্ত অন্ধকারময় বিষাদ, হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে নৈরাশ্যের করাল ছায়ায় জীবনের উজ্জ্বলতাময় সদ্বৃত্তিগুলি আস্তে আস্তে অলক্ষিতভাবে হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় এবং ফলে আমরা বিষাদে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি।

এই হইল আমাদের কার্য্যজীবনের পূর্ব্বরূপ ও পরিণাম, অর্থাৎ পূর্ব্বরূপ হইতেছে রাগ ও দ্বেষ, এবং পররূপ বা পরিণাম হইল হর্ষ ও বিষাদ। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, যে এই রাগ ও দ্বেষ এবং হর্ষ ও বিষাদের ভিত্তি সঙ্কীর্ণতাময় আত্মাভিমান, এবং এই সঙ্কীর্ণতাময় আত্মাভিমান রাগ ও দ্বেষ এবং হর্ষ ও বিষাদের আতিশয্যের সঙ্গে সঙ্গে অতিশয়িত ভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এই সঙ্কীর্ণতাময় আত্মাভিমানের যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, মনুষ্য হৃদয়ের পবিত্রবৃত্তি গুলি ততই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে ঘৃণিত পশুভাবময় জঘন্য বৃত্তিগুলি, এবং

একে মনুষ্য হৃদয়ের সর্ব্বাংশ অধিকার করিয়া থাকে ; এই সঙ্কীর্ণতাময় আত্মাভিমানকে আমরা প্রায় স্বার্থান্ধতা, নীচতা, ও আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি।

এই জঘন্য স্বার্থান্ধতা, মনুষ্যসমাজকে কিপর্য্যন্ত হীন ও পশুভাবাপন্ন করিয়া ফেলে, তাহা বুঝিবার জন্য আমাদের দূরে যাইতে হইবে না, আমরাই তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল। আমার বিশ্বাস আমাদের সমাজে স্বার্থান্ধতা প্রবেশ করিয়া যে পরিমাণে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্যজাতি কখনও কোন অবস্থায় এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধতার বশে এরূপ সর্ব্বনাশের পথে বিচরণ করে নাই এবং বোধ হয় করিবে না। এই স্বার্থান্ধতার বিষ আমাদের সমাজ-শরীরকে যে পরিমাণে জর্জ্জর করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, সে পরিমাণে উপযুক্ত ঔষধ সেবন করিবার জন্য আমরা কোন দিন প্রস্তুত হই নাই, হইতে বোধ হয় ইচ্ছাও করি নাই। হায়! আমরা কি হতভাগ্য ও কি মূঢ়! এই স্বার্থান্ধতারূপ মহাবিষের একমাত্র মহৌষধ আমাদের গৃহে থাকিতেও আমরা এতদিন তাহার দিকে ফিরিয়া দেখি নাই। আমাদের এই সর্ব্বনাশের বিষয়, বিবেক নেত্রে বহুদিন পূর্ব্বে দেখিয়া আমাদেরই উদ্ধারের জন্য মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ সেই পরমেশ্বরাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে যে গীতারূপ অমৃতময় মহৌষধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কই সেই গীতারূপ মহৌষধকে আমরা এপর্য্যন্ত যে প্রণালীতে ব্যবহার করা উচিত তাহা কি করিয়াছি? বোধ হয়, কখনই করি নাই! যদি করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের সমাজ অদ্য এ আকারের হইত না।

দেশের আশাস্থল শিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণ! আর কেন ভাই, রোগ ত নির্ণীত হইয়াছে, বৃথা অভিমানের বশে আপন আপন জিদ বজায় রাখিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাহ্য

উপায় দ্বারা এই দুরপনেয় সর্ব্বনাশকর রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে বৃথা কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? তোমাদের এই আভ্যন্তরীণ মহাব্যাধির একমাত্র অমৃতময় মহৌষধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আশ্রয় গ্রহণ কর। আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি মহাত্মগণের ন্যায় সুযোগ্য আভ্যন্তরীণ ব্যাধির চিকিৎসকগণেরি প্রদর্শিত বিধানানুসারে এই গীতার তাৎপর্য্য বিচার করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহৌষধ বাছিয়া লও; সেই ঔষধের বলে—দেখিবে, আমাদের কাল্পনিক আত্মাভিমান কোথায় উড়িয়া যাইবে। একাত্মবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত গীতোক্ত কর্ম্মযোগের ভয়হীন আশ্রয় গ্রহণ করিলে, বহুকালের বিস্মৃত সেই বিশ্বব্যাপি আত্মপ্রেমের অমৃতরসাস্বাদে আমাদের সেই সর্ব্বনাশকর ব্যক্তিগত তুচ্ছ স্বার্থাভিমানের বিষময় জ্বালা শীঘ্রই মিটিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

হৃদয়ের আবেগে প্রকৃত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি; যাক, এক্ষণে প্রকৃতানুসরণ করাই যুক্তি যুক্ত হইতেছে। কোন কার্য্যই স্বতন্ত্রভাবে আমরা করিতে পারি না, অথচ কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমিই করিতেছি—এই প্রকার অভিমানই প্রায় সকল কার্য্য সাধনের উপযোগী হয়, ইহাই যদি সংসারের স্বভাব হয়, তখন কি উপায়ে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিলে আমরা কার্য্য করিতে পারি, এই প্রশ্নটির সমাধান না হইলে, আমরা গীতোক্ত কর্ম্মযোগের স্বরূপ বুঝিতে পারি না; সুতরাং তাহার অধিকারীও হইতে পারি না; এই কারণে এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত গীতার অভিপ্রেত, আমি এইক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব; গীতাতে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রাণিনিচয় জন্মলাভ করিবার পূর্ব্বে

অব্যক্ত ছিল, কেবল বর্ত্তমান অবস্থাতেই ইহারা ব্যক্ত ভাব লাভ করিয়াছে। আবার ধ্বংসের সময়ে ইহারা অব্যক্তে মিশাইবে; এইরূপ অবস্থায় এ জগতে অনুশোচনা কি প্রকারে আসিতে পারে ? মানব! অব্যক্তরূপ মহাসমুদ্রের মধ্য হইতে অব্যক্ত কারণেরই প্রভাবে তুমি এ জগতে দেখা দিয়াছ, আবার সেই অব্যক্ত কারণের বশে সেই অব্যক্তরূপ মহাসাগরেই তোমাকে মিশিয়া যাইতে হইবে, তাহাও স্থির! তখন এই দুই দিনের জন্য এই ব্যক্তভাবের উপর নির্ভর করিয়া তোমার নিজের কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? যাহার নিজের সত্তা সেই অব্যক্ত শক্তির সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত, সে কি কোন সময়ে স্বতন্ত্র হইয়া সেই সর্ব্বনিয়মনকারিণী অচিন্ত্য অব্যক্ত শক্তির অপেক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে? কখনই না। তুমি ভ্রান্ত জীব! হয়ত বলিয়া বসিবে, যে আমি দেখিতে পাইতেছি, যে আমি ইচ্ছা করিয়া এইকার্য্যটী কাহারও সাহায্য না লইয়া অনায়াসে নিষ্পন্ন করিলাম; সুতরাং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই এই কার্য্যের কারণ। কই এখানে ত কোন অব্যক্ত শক্তির সাহায্য লইবার আবশ্যকতা দেখিতে পাই না। তোমার দুরদৃষ্ট! তুমি চক্ষু বুজিয়া থাকিলে আমি দেখাইব কি প্রকারে? জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি যে স্বতন্ত্র ইচ্ছার দ্বারা এই কার্য্যটী করিলে বাস্তবিকই কি উহা স্বতন্ত্র ইচ্ছা? উহা কি বিনা কারণে তোমার হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়াছে? কখনই না! যাহা সর্ব্বদা থাকে না, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হয়, তাহা কি কখন কারণ নিরপেক্ষ হইতে পারে? তোমার ঐ ইচ্ছাও যখন নিত্য নহে, তখন নিশ্চয়ই উহার কোন কারণ আছে। সে কারণ কি? তুমি বলিবে, সেই ইচ্ছা যখন আমার, তখন আমিই সেই ইচ্ছার কারণ—একথা ঠিক নহে; তুমিই যদি ঐ ইচ্ছার কারণ হও, তাহা হইলে যত কাল তুমি রহিয়াছ, সকল সময়েই তোমার ঐ ইচ্ছাটী হয় না কেন? সুতরাং তোমাকে বলিতে হইতেছে, যে তুমি ছাড়াও তোমার ইচ্ছার আরও অনেক কারণ আছে। সেইগুলি সর্ব্বদা মিলিত

হয় না বলিয়া তোমার ইচ্ছাও সর্ব্বদা হয় না এবং সেই সকল কারণকে একসঙ্গে মিলাইবার শক্তি তোমার আয়ত্ত নহে; অথচ সেই শক্তি, নিশ্চয়ই আছে; না থাকিলে ঐ সকল কারণকে একত্র করে কে? সেই শক্তি আছে অথচ তাহার আশ্রয় আমিও নহি, কিন্তু আমার ইচ্ছা সেই শক্তি বিশেষের দ্বারাই উৎপাদিত হয়, ইহা যদি স্থির হইল, তাহা হইলেই বেশ বুঝা গেল, আমরা ও আমাদের যতকিছু কার্য্য, সকলই সেই অব্যক্ত শক্তির সম্পূর্ণ করায়ত্ত। গীতাশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিতে পারে, এরূপ যুক্তি এখন পর্য্যন্ত কোন মনস্বীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয় নাই। এই অচিন্ত্যাব্যক্ত কারণবাদই গীতার সিদ্ধান্ত এবং ইহাই বেদান্তদর্শনের মায়াবাদের ভিত্তিস্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্তাবাদ বলিয়া খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই সর্ব্বকার্য্যকারিণী অব্যক্ত ঐশী শক্তির স্বরূপ আমরা যতই আলোচনা করি, ততই আমাদের নিজ কর্ত্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে, সেই ঐশীশক্তির স্বরূপ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে, আমরা প্রত্যেকেই ভাবি যে, এ জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা আমারই হওয়া উচিত, আমার অভিলাষ পূর্ণ করাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য, আমার স্বার্থসিদ্ধির পথে বিঘ্ন করে বলিয়া যদি সহস্র সহস্র প্রাণীর ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে আমার কি ক্ষতি? আমার সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য আমি সকল কার্য্যই করিতে পারি; ইত্যাদি পশুভাবময় মনোবৃত্তিই আমাদের হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে। কিন্তু যদি আমরা বুঝি যে ঐ বায়ুভরে বিতাড়িত তৃণের ন্যায় এসংসারে আমি সেই অচিন্ত্যলক্ষ্য পূর্ণ করিতে, সতত উদ্যত—সেই মহামহীয়সী অব্যক্তশক্তির ক্রীড়া পুত্তলি ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই মহাশক্তির অপার-অনন্ত-ক্রোড়ে পড়িয়া আমার ন্যায় কোটী কোটী জীব কত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, কতই দুঃখের বিভীষিকায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে, আমারই ন্যায়

সকলেই সেই জঘন্য কর্তৃত্বাভিমানের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে, সংসার ভার বহিতে বহিতে সময়ে সময়ে অতর্কিতভাবে সেই অব্যক্তশক্তির দিকে আশা, বিস্ময়, ভয় ও বিষাদের সহিত ফিরিয়া চাহিতেছে আবার সেই শক্তিরই অচিন্ত্য প্রভাবে মোহনিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িতেছে, তখন আমাদের হৃদয় হইতে সেই জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমানের নিবিড় অন্ধকার ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকে; সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে বিশ্বজনীন উদার ভাবের উদয় হয়; সকল জীবের সমতা জ্ঞান তখন আপনিই নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রকাশ পায়; তুচ্ছ দেহাভিমান দূরে যায়, সার্ব্বজনীন সহানুভূতির অমৃতবারি-সেকে হৃদয়ক্ষেত্রে একে একে বিশ্বব্যাপী স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতি দেবভাবোচিত সদ্বৃত্তিনিচয় অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

এইপ্রকার ভাবের উদয় হইলে রাগ ও দ্বেষ পূর্ব্বক কোন কার্য্য করিতে আর আমাদের প্রবৃত্তি হয় না; বিশ্বের কার্য্য তখন আমার হইয়া উঠে, যে আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞানে আমি ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, সেই পরিচ্ছিন্নত্ব জ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় সকলের আত্মাতেই আমার আত্মার সদ্ভাব বুঝিতে পারি বলিয়া, আমি, তখন অপরের দুঃখকে নিজের ভাবিয়া প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই; অপরের সুখ দেখিলে আপনাহইতেই আমার নয়নে আনন্দের দরদরিত অশ্রুধারা বহিতে থাকে; ইহাই হইল গীতার কর্ম্মযোগের অধিকারাবস্থা। এই সময়ে আমাদের কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আর সে রাগ দ্বেষ থাকে না। এই সময়ে আমরা সেই অব্যক্ত-শক্তির দুর্লক্ষ্য প্রেরণায় হয়ত কোন কার্য্য করিয়া বসি, অথবা কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় উল্লাসের আবেগময় হাস্য উঠে না, বা বিষাদে আমাদিগকে হা হতাশ করিতে হয় না; তখন আমরা যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি, যাহা কিছু দেখি, বা যাহা

কিছু বলি, সেই কার্য্যে, সেই ভাবনায়, সেই দর্শনে, বা সেই বাক্যে সঙ্কীর্ণতাময় স্বার্থাভিসন্ধান মিশিতে পারে না; তখন আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মূলে আমরা সেই অব্যক্ত শক্তির বিলাস দেখিতে পাই; সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া উল্লাস বা বিষাদ বর্জ্জন করিয়া আমাদের প্রত্যেক কার্য্যকে সেই অব্যক্তশক্তি-প্রবর্ত্তিত অনাদি অনন্ত কার্য্যচক্রের অন্তর্গত এক একটী সামান্য অংশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এই জন্য আমাদের সেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ স্পৃহা স্বতই নিবৃত্ত হয়, এবং আমরা বিবেকনেত্রে দেখিতে পাই, যে সেই অচিন্ত্য অব্যক্তশক্তিরও নিয়ন্তা, সর্ব্বভূত মহেশ্বর, সকলজীবের আত্মার আত্মা, কালস্বরূপ পরমেশ্বরই প্রকৃতপক্ষে সেই সকল কার্য্য করিতেছেন এবং ঐসকল কার্য্যের ফলও তাঁহারই অধীন। আমাকে কেবল নিমিত্তরূপে দাঁড় করাইয়া সেই অনন্তলীলাময় পরমেশ, এই বৈচিত্র্যময় কার্য্যকারণ-পরম্পরারূপ সংসার-চক্রকে নিয়ত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। আমাকে যে কার্য্যের জন্য তিনি এই ব্যবহার ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছেন, আমি বাধ্য হইয়া সে কার্য্য অবশ্যই করিব; প্রকৃতপক্ষে সেই কার্য্যের দায়িত্বও আমাতে নাই; সুতরাং তাহার ফলভোক্তৃত্ব আমার থাকিবে, কোন্-যুক্তিতে? এরূপ অবস্থায় মনুষ্য প্রবৃত্তির নেতৃত্ব, মনুষ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। তখন শাস্ত্রই অধিকারের বিভাগ প্রদর্শন করাইয়া তদনুসারে মনুষ্যের সেই সেই কার্য্যের প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেয়, ব্যক্তিগত প্রয়োজন জ্ঞানের পরিবর্ত্তে শাস্ত্র জ্ঞানই সর্ব্বথা মনুষ্যের সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক হইয়া উঠে; যে সমাজে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই সমাজের আর অধঃপতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সে সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট জন কার্য্যের জন্যই কার্য্য করিয়া থাকে; ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখের সহিত সে সমাজের কার্য্যাকার্য্যের সম্বন্ধ একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। ইহাই হইল গীতার কর্ম্মযোগের অধিকার ভূমি। এই ভূমিতে উপস্থিত হইবারজন্য

প্রত্যেক বুদ্ধিমান মনুষ্যের প্রযত্ন করা উচিত। যে সিদ্ধান্তের বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এই কর্ম্মযোগের সুগভীর দর্শন প্রচার করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃসাধনের পথ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেক নেত্রের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার অন্ধবিশ্বাসের ছায়াও পতিত হয় নাই। শুষ্ক ক্লেশকর তর্কের কৃত্রিম আবরণে তাহা আবৃত নহে। ব্যক্তিগত স্বার্থানুসন্ধিৎসা বা তীব্র অহঙ্কার মূলক তীব্র বিভীষিকা দ্বারা তাহার কোন অংশও কলঙ্কিত নহে। সর্ব্বজন সংবেদ্য সরল যুক্তির সহিত ঐ সিদ্ধান্ত অণুমাত্রও বিরোধ করে না; বিশ্বজনীন প্রেম মানবচরিত্রের অন্তস্তত্ত্বের সম্পূর্ণজ্ঞান, জড়জগৎ ও চেতনের ভ্রান্তিহীন স্বরূপলব্ধি এবং সংসারতত্ত্বের সম্পুর্ণ রহস্যজ্ঞান একত্র মিলিত হইয়া, সেই জীবোদ্ধারদৃঢ়ব্রত পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেবের করুণাময় হৃদয় সাগর হইতে এই মহা সিদ্ধান্তরূপ মহারত্নকে আবিষ্কৃত করিয়াছে।

এই কর্ম্মযোগরূপ মহাসিদ্ধান্তরূপ মহামণির উজ্জ্বল আলোকে আজি না হয় কাল, কাল না হয়, বৎসরান্তে, বৎসরান্তে না হয় যুগান্তে, মানব হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতাময় অন্ধকার যে একদিন দূর হইবেই সে বিষয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই কর্ম্মযোগের নিদানস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস, সর্ব্বজনীন ঐকাত্ম্যভাব, বিশ্বজনীন প্রেম ও অকপটচিত্তবৃত্তি বিষয়ে গীতাশাস্ত্রে যে কয়টী সূত্রস্থানীয় শ্লোক আছে, তাহা হইতে গুটি কয়েক এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া আমি আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চাহি—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।

ন কর্ম্ম ফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্ ।
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত ।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্ ॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর ।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্ ॥ ইত্যাদি ।

এইসকল গীতার বচনগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, আমরা কর্ম্মযোগের স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারি। আর এই বিষয়টী এতই দুরবগাহ এবং এতই প্রয়োজনীয়, যে এক দিনে একটী প্রবন্ধে সরলভাবে এই গীতার সারভূত কর্ম্মযোগের স্বরূপ সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করা আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। কর্ম্মযোগের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিব, আমার ন্যায় অকিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে এ প্রকার আশাও দুরাশা, তাহাও আমার অবিদিত নহে; তবে সনাতন ধর্ম্মের আন্দোলন যে ভাবেই করা যায়, তাহাতে বস্তুস্বভাব বশতঃ কিছু না কিছু উপকার হইয়া থাকে, এই সাধারণ বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, আমি বামন হইয়া, উন্নত পুরুষ-লভ্য ফলের জন্য হাত বাড়াইয়াছি। আশা করি ও প্রার্থনা করি, সহৃদয় ভগবৎপ্রেমিক শ্রোতা মহাশয়গণ আমার এই দুর্বিনয় ব্যবহার অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।